কলমকারির ইতিকথা

কলমকারি শিল্প আজ ঘরে ঘরে সমাদৃত। কিন্তু এর ইতিহাস আমরা কতটুকুই বা জানি? সেই ইতিহাসের ঝাঁপি খুলছেন ঈশিতা সেনগুপ্ত।

দেখতে দেখতে আরো একটা শারদোৎসব চলে এল। গতবছর থেকেই শাড়ি জামাকাপড়ে আমরা কলমকারি শিল্পের জয়জয়কার দেখতে পাচ্ছি। এই কলমকারির জন্ম কিন্তু আমাদের বাংলায় নয়, সুদূর অন্ধ্রপ্রদেশ ও ইরানে। 'কলমকারি' কথাটিই জন্ম নিয়েছে দুটো পারসিক শব্দের মেলবন্ধনে — কলম (বা ঘলম) ও কারি (অর্থাৎ কারিগরী)। যেই শিল্পে কলমের ব্যবহার হয়, তারই নাম কলমকারি। আমাদের সামনে কলমকারি ফুটে ওঠে দুইভাবে — কিছু শিল্পী হাতে আঁকেন ও কিছু শিল্পী কাঠের ব্লক করে ছাপেন।

কলমকারি ছবির প্রধান বৈশিষ্ট্য তার রেখা। বেশিরভাগটাই আঁকা হয় বক্ররেখায়। খুব প্রয়োজন ছাড়া সরলরেখার প্রয়োগ প্রায় নেই বললেই চলে। সুর-অসুর, মানুষ সবারই মুখগুলো একটু গোল, চোখ বড় বড়, ঠোঁট একটু মোটা। ধনুকের মতো বাঁকা ভুরু আর চোখের মাঝেও থাকে আর একটি বক্ররেখা। নারী-পুরুষ উভয়ের গায়েই প্রচুর গয়না। জামাকাপড়েও দেখি নানান নক্সার কারুকাজ। ছবির বিষয় নারী-পুরুষ বা পাখপাখালি যাই হোক না কেন, বেশিরভাগ ছবিতেই পাই নানান ফুল। তা হয়তো দক্ষিণ-ভারতীয়দের পুষ্প-প্রীতির বহিঃপ্রকাশ। ছবির বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন আউটার ফ্রেমের প্রতি কমলকারি শিল্পীরা যথেষ্ট সতর্ক, সেটিও নকশা করা, যেন ছবিরই অংশ।

দক্ষিণ-ভারতে কলমকারির দুটি আঁতুরঘর — চেন্নাই থেকে ৮০ মাইল দূরে শ্রীকালহস্তী ও হায়দ্রাবাদ থেকে পূর্বে ২০০ মাইল দূরে মাসুলিপাটনাম। স্বর্ণমুখী নদীর ধারে শ্রীকালহস্তী কলমকারি গড়ে উঠেছিল আজ থেকে আনুমানিক ৫০০ বছর আগে বিজয়নগরের তুলুভ বংশের রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের (১৪৭০ – ১৫২১) রাজত্বকালে। বালোজা নামক চুড়ি প্রস্তুতকারী গোষ্ঠী এ শিল্পকর্মে নিযুক্ত ছিল। মূলতঃ মন্দির ও দেবদেবীকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে এই শৈলী। স্বাভাবিকভাবেই তাই ছবিগুলিতে আমরা দেখি রামায়ণ, মহাভারত, গীতা বা পুরাণের নানান ছবি। এই ছবিগুলির বিষয় হিসাবে উঠে এসেছে — সপ্তাশ্বরথে সূর্যদেব, গীতার উপদেশপ্রদানরত শ্রীকৃষ্ণ, দেবী অণ্ডাল, সপরিবার নটরাজ, দশাবতার, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় অর্জুন, রামসীতা, গোপী পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণ, রুক্মিনী ও সত্যভামার সাথে শ্রীকৃষ্ণ, দোলায় রাধাকৃষ্ণ, চতুর্হস্তযুক্ত গণেশ, অষ্টহস্তযুক্ত মহিষাসুরমর্দিনী ইত্যাদি। এই ছবিগুলিতে সাধারণত দেবতাকে আঁকা হয় লাল রঙে, দানবকে নীল ও সবুজ রঙে। নারী ফুটে ওঠে হলুদ রঙে। আর পটভূমি রচিত হয় লাল রঙে।

অন্যদিকে মাসুলিপাটনাম কলমকারি গড়ে উঠেছে কৃষ্ণা জেলার পেডানা অঞ্চলে। গোলকোণ্ডার সুলতানদের হাত ধরেই এই কলমকারির উদ্ভব। স্বাভাবিক ভাবেই মাসুলিপাটনাম কলমকারিতে আমরা দেখি পারসিক নকশা। এখানে কিন্তু তাঁতি সম্প্রদায়ই এই শৈলীকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

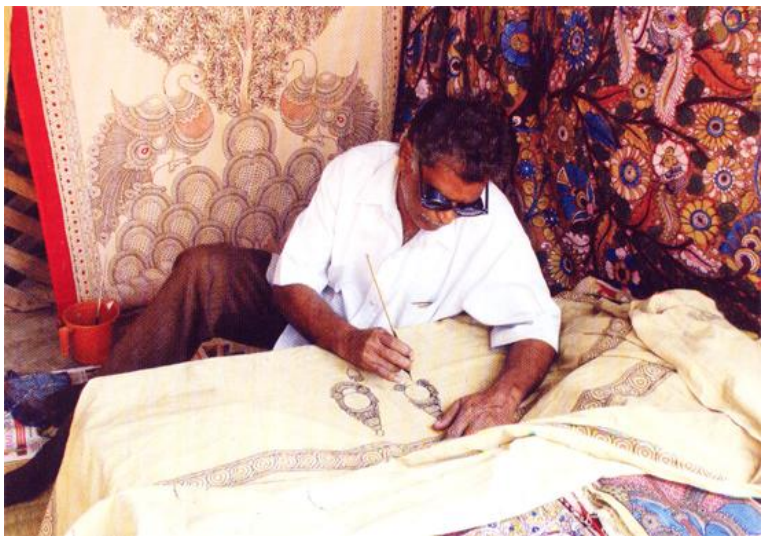

শ্রীকালহস্তী বা মাসুলিপাটনাম দু'জায়গাতেই কলমকারির করণকৌশল কিন্তু একই। প্রথমে যে কাপড়টিতে কাজ করা হবে সেটি এক ঘণ্টা গরু বা মোষের দুধে ভেজানো হয় যাতে কাপড়ে রঙ না ছড়িয়ে পড়ে। তারপর বাঁশ ও খেজুরের কঞ্চির গায়ে সুতির কাপড় জড়িয়ে সুতো দিয়ে বেঁধে কলম তৈরি করা হয়। তারপর, কালো আউটলাইন আঁকা হয়। এই কালো রঙ বা কাসিমকারান তৈরি করা হয় লৌহচূর্ণ, আখের গুড়, খেজুর গুড় জলে গুলে দশদিন ধরে পচিয়ে। তারপর সেই মিশ্রণটি ছেঁকে নিয়ে কলম দিয়ে আঁকা হয় রেখা। কখনো বা তেঁতুলের কাণ্ড ও কয়লা মিশিয়ে খসড়া আঁকার কালো রঙ তৈরি হয়। এই কালোরঙটি দীর্ঘস্থায়ী করা হয় মাইরোবালান ফুল (স্থানীয় ভাষায় কারাকাপুড্ডু) ও কুঁড়ির (কোরাকাপিণ্ডে) সাহায্যে। এরপর একে একে রঙ ভরার পালা। প্রথমে হাল্কা হলুদ, তারপর গাঢ় হলুদ, লাল, সবুজ, গোলাপী ও সবশেষে নীল রঙ লাগাবার পালা। সবগুলি রঙ কিন্তু ভেষজ — নানান ফল, ফুল, লতা, পাতা থেকে সংগ্রহ করা। হাল্কা হলুদ তৈরি হয় বেদানার খোসা থেকে। হলুদ তৈরী হয় মাইরোবালান ফুল ও এ্যালাম গুঁড়ো করে জলে ফুটিয়ে। লাল রঙ তৈরি হয় চাতালাকোড়ি বা সুরুদুচেক্কা মূল থেকে। সবুজ রঙ পাওয়া যায় মাইরোবালান ফুল, কাসিমকারান ও এ্যালাম মিশিয়ে। গোলাপী রঙ চাডালাকোড়ি মূল থেকে বানানো হয়। নীল রঙ হয় তুঁত থেকে। খুব উজ্জ্বল রঙ ব্যবহার করলেও শেষে কিন্তু আমরা দেখি অদ্ভূত কমনীয় একটা ম্যাট ফিনিশ।

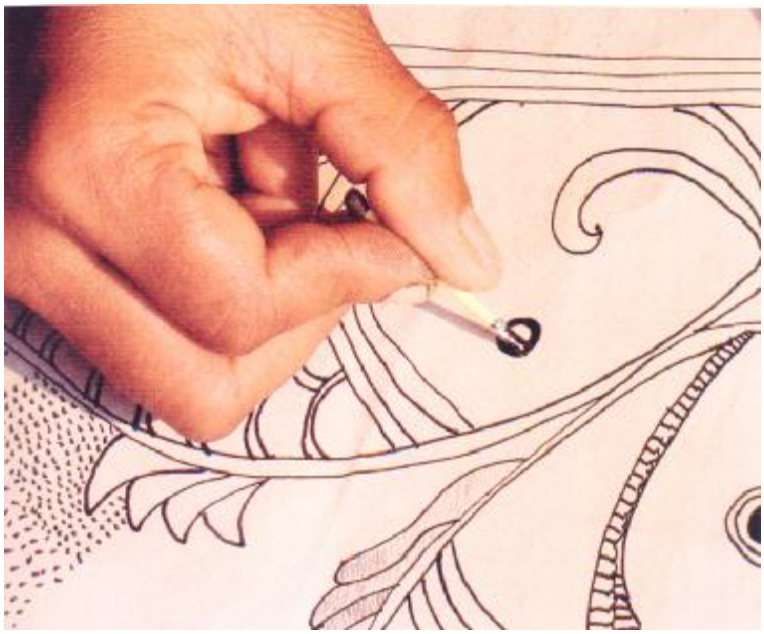

শ্রীকালহস্তী শৈলীতে আছে জটিল সতেরোটি ধাপ। এক একটি সূক্ষ্ম ছবি করতে তাই নয়-দশ মাসও লেগে যেতে পারে। কিন্তু মাসুলিপাটনাম ঘরানায় দেখা যায় বারোটি ধাপ। মাসুলিপাটনামে কাঠের ব্লকের সাহায্যে কাপড়ে প্রথমে লাল ও কালো অংশ ছেপে নেওয়া হয়। তারপর এই কালো ও লাল অংশগুলি কলমের

সাহায্যে গলানো মোম দিয়ে সাবধানে ঢেকে দেওয়া হয়। এবারে কাপড়টি ঠাণ্ডা নীল রঙে ডোবানো হয়। কাপড়ের মোমে ঢাকা অংশে স্বাভাবিক কারণেই রঙ ধরে না। এরপর কাপড়টি শুকিয়ে নিয়ে গরম জলে দিয়ে মোম ছাড়িয়ে নেওয়া হয় এবং আবার শুকিয়ে সরাসরি হলুদ ও সবুজ রঙ লাগানো হয়।

তাঞ্জোর এলাকায় মারাঠা যুগে রাজা সার্ফোজী ও শিবাজীর রাজত্বকালে আর এক নতুন ঘরানার কলমকারি গড়ে ওঠে। রাজারাজড়াদের পোষাকে ব্রোকেডের উপর এই নতুন ধরণের কলমকারির নাম কার্রুপুর শৈলী।

ব্রিটিশ শাসনকালে সাহেবদের মন পেতে কলমকারি শিল্পীরা বেশী করে ফুল লতা পাতা আঁকতেন। ওলন্দাজদের হাত ধরে পট বা পোশাক-আশাক ছাড়িয়ে বিছানার চাদর, পর্দার কাপড় রাঙানো হতে থাকে কলমকারির ধাঁচে। কলমকারির বিশ্বায়নে কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়ের অবদান অনস্বীকার্য। শ্রীকালহস্তী ঘরানার শ্রীরামাচান্দ্রাইয়া গিনেস বুক অফ রেকর্ডসেও স্থান করে নিয়েছেন। শ্রীকালহস্তীতে আজও প্রায় দেড়শজন শিল্পী নানান পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন সুপ্রাচীন এই শিল্পশৈলী। বাঙালিরাও যে আজকাল কলমকারির আদর করছেন এ বড় আনন্দের কথা।

ছবি সৌজন্য : Indian Folk And Tribal Paintings লেখক Charu Smita Gupta প্রকাশক Roli Books